ইউনিট
১১

মুদ্রা ও মুদ্রাস্ফীতি

Money and Inflation

ভূমিকা

সাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যমকেই অর্থ বলা হয়। অর্থ এমন একটি জিনিস, যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে এবং যার দ্বারা সকল প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। একসময় মানুষ দ্রব্যের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন লেনদেন করত। কিন্তু দ্রব্যের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালনা করতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো। এই সকল সমস্যা দূর করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য লেনদেনের মাধ্যম খুঁজে বের করতে শুরু করল মানুষ। মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলই হলো অর্থ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১ : অর্থ ও অর্থের কার্যাবলি

পাঠ ১১.২ : অর্থের চাহিদা ও যোগান

পাঠ ১১.৩ : অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

পাঠ ১১.৪ : মুদ্রাস্ফীতি

পাঠ ১১.১ অর্থ ও অর্থের কার্যাবলি
Money & Functions of Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার অর্থের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- অর্থের কার্যাবলি বুঝতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্রব্য বিনিময় প্রথা (Barter System of Commodity)

উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করার নিয়মকে বিনিময় প্রথা বলা হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে যখন অর্থের প্রচলন ছিল না তখন মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য সংগ্রহ করত। অর্থাৎ নিজের উদ্বৃত্ত দ্রবটির বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি সংগ্রহ করত। যেমন–কৃষক গমের বিনিময়ে জেলের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করত আবার জেলে মাছের বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে গম সংগ্রহ করত। এভাবে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লেনদেন করাকে বলা হয় বিনিময় প্রথা। দ্রব্য বিনিময় প্রথার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো।

১। দ্রব্য বিনিময় প্রথার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো পরস্পরের অভাবে অসামঞ্জস্যতা। যেমন–একজন কৃষকের গমের বিনিময়ে মাছের প্রয়োজন। অথচ জেলের প্রয়োজন কাপড়। তাহলে কৃষক এবং জেলের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় হওয়া সম্ভব নয়। ২। দ্রব্য বিনিময় প্রথার আরেকটি বড় অসুবিধা হলো মানুষের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। কেননা দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় হলে দীর্ঘমেয়াদে দ্রব্য পচে যেতে পারে কিংবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৩। একজন লোক যদি যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে চাইত তাহলে বিনিময় প্রথার অধীনে সম্ভব ছিল না। কেননা কোথাও ভ্রমণ করতে হলে সাথে দ্রব্য নিয়ে যেতে হতো। কিন্তু খুব বেশি দ্রব্যসামগ্রী সাথে রাখা সম্ভব হতো না। ৪। দ্রব্য বিনিময় প্রথা কার্যকর হতে হলে দ্রব্যসমূহ বিভাজ্য হতে হয়। কিন্তু এমন কিছু দ্রব্য আছে, যেগুলো বিভাজন করা যায় না। সেক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা কার্যকর করা কঠিন। যেমন–একটি গরু ও একটি ঘড়ির কথা বলতে পারি।

ধরে নিই একটি গরু ১০টি ঘড়ির সমান। এ ক্ষেত্রে গরুওয়ালা একটি ঘড়ি পেতে চাইলে তাকে ১/১০ ভাগ গরুর মাংস দিতে হবে। কিন্তু গরুকে ১০ ভাগ করে ১ ভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে গরুওয়ালা পুরো গরুর বিনিময়ে ১টি ঘড়ি বিনিময় করে। যার ফলে গরুওয়ালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫। দ্রব্য বিনিময় প্রথার আরেকটি সমস্যা হলো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা। যেমন–১টি গরু সমান ১০টি ঘড়ি হলে ১টি গরুর বিনিময়ে কত মণ চাল কিংবা কয়টি শার্ট পাওয়া যাবে এসব নির্ধারণ করাছিল খুবই কষ্টসাধ্য। ৬। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অধীনে ঋণ প্রদান, ঋণগ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধ অসুবিধা হতো। কেননা ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতার কাছ থেকে ১ মণ চাল সংগ্রহ করে তাহলে নির্দিষ্ট সময় পরে আবার ১ মণ চাল পরিশোধ করতে হতো। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি চাল ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে ঋণদাতা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করা হতো সেই একই দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হতো, যা বাস্তবে অসম্ভব। উপরোক্ত অসুবিধাগুলোর কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা রহিত হয়ে অর্থের প্রচলন এবং অর্থ লেনদেনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

অর্থের সৃষ্টি ও এর বিভিন্ন ধারণা : সাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যমকেই অর্থ বলা হয়। অর্থ এমন একটি জিনিস, যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে এবং যার দ্বারা সকল প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।

একসময় মানুষ দ্রব্যের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন লেনদেন করত। কিন্তু দ্রব্যের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালনা করতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো। এই সকল সমস্যা দূর করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য লেনদেনের মাধ্যম খুঁজে বের করতে শুরু করল মানুষ। মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলই হলো অর্থ। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে অর্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

১। অর্থনীতিবিদ জিউফ্রে ক্রাউথার বলেন, 'অর্থ এমন একটি জিনিস, যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।'

২। অর্থনীতিবিদ Richard Sayers বলেন, 'যে বস্তু দেনা-পাওনা মিটানোর কার্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তাকে অর্থ বলা হয়।'

৩। অর্থনীতিবিদ Michael Walker-এর মতে, 'অর্থ যা করে তা-ই অর্থ।'

৪। অর্থনীতিবিদ Dennis Robertson বলেন, 'দ্রব্য সামগ্রিক দাম অথবা অন্যান্য ব্যবসায়গত কার্যকলাপের পাওনা হিসাবে যা সাধারণত সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তা-ই অর্থ।'

৫। অর্থনীতিবিদ George Cole বলেন, 'অর্থ এমন একটি জিনিস, যা সকলেই সাধারণভাবে দেনা-পাওনা মেটাতে এবং ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করে।'

৬। অর্থনীতিবিদ George Knapp-এর মতে, 'যে বস্তু ঋণ পরিশোধের জন্য আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য তাকেই অর্থ বলা হয়।'

৭। অর্থনীতিবিদ John Maynard Keynes বলেন, 'যে বস্তু হস্তান্তর করে ঋণ ও দামের চুক্তি মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা যায় তাকেই অর্থ বলে।'

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম এবং দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বা মুদ্রা বলা হয়।

অর্থের বিভিন্ন ধারণা (Different Concepts of Money) : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রচলিত আছে। আবার দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১। হিসাবগত মুদ্রা (Money of Account) : অর্থের যে নাম বা উপাধিতে দেশের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ ও লেনদেন চলে তাকে বলা হয় হিসাবগত মুদ্রা। যেমন–বাংলাদেশের টাকা, ভারতের রুপি, আমেরিকার ডলার, ব্রিটেনের পাউন্ড, কুয়েতের দিনার ইত্যাদি হিসাবি মুদ্রার উদাহরণ।

২। প্রকৃত মুদ্রা (Actual Money) : বাস্তব জীবনে যে অর্থের মাধ্যমে লেনদেনকার্য সম্পাদন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রকৃত মুদ্রা। যেমন– ১ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রচলিত সকল ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোটকে প্রকৃত মুদ্রা বলা হয়।

৩। বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) : যে অর্থ সরকারের আইনগতভাবে স্বীকৃত এবং লেনদেন ক্ষেত্রে ও জনসাধারণ ব্যবহার করতে বাধ্য থাকে, তাকে বলা হয় বিহিত মুদ্রা। যেমন–বাংলাদেশের প্রচলিত ১ টাকা, ২ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা ইত্যাদি কাগজি নোট ও বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা হলো বিহিত মুদ্রা।

৪। ঐচ্ছিক মুদ্রা (Optional Money) : যে অর্থ জনগণ লেনদেনকার্যে ব্যবহার করতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়; তবে প্রয়োজনে লেনদেনকাজে সহায়তা করে, তাকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলা হয়। যেমন–ব্যাংকের চেক, প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি।

৫। প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Money) : যে মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য এবং বাস্তব মূল্য পরস্পর সমান হয়, তাকে বলা হয় প্রামাণিক মুদ্রা। অর্থাৎ প্রামাণিক মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে যে ধাতু পাওয়া যায় তার মূল্য মুদ্রার মূল্যের সমপরিমাণ হবে।

৬। প্রতীক মুদ্রা (Token Money) : যে ধাতব অর্থের গায়ে লিখিত মূল্য তার অন্তর্নিহিত মূল্যের চেয়ে কম হয় তাকে প্রতীক মুদ্রা বলা হয়।

৭। আদিষ্ট মুদ্রা (Fiat Money) : যে অর্থ সরকারের নির্বাহী আদেশের কারণে জনগণ লেনদেনকার্যে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়; কিন্তু এ ধরনের অর্থের নিজস্ব কোনো নির্দিষ্ট মূল্য নেই, তাকে আদিষ্ট মুদ্রা বলা হয়। যেমন–সরকারি আদেশে দেশে

প্রচলিত কাগজি নোটসমূহকে আদিষ্ট মুদ্রা বলা হয়।

৮। ব্যাংক অর্থ (Bank Money) : বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করার জন্য ব্যাংকসমূহ যেসব ঋণপত্র ইস্যু করে, সেগুলোকে বলা হয় ব্যাংক অর্থ। যেমন–ব্যাংক ড্রাফট, পে-অডার্র, চেক ইত্যাদি।

৯। প্রায় মুদ্রা (Near Money) : যে সকল সম্পদ সরাসরি লেনদেনকাজে ব্যবহার করা যায় না; তবে চাইলে সহজেই অর্থে রূপান্তর করা যায়, সেগুলোকে বলা হয় প্রায় মুদ্রা। যেমন–ট্রেজারি বিল, চাহিদা আমানত, প্রাইজ বন্ড, সরকারি বন্ড ইত্যাদি।

১০। সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money) : সংকীর্ণ মুদ্রা বলতে আমরা ব্যাংকবহির্ভূত অর্থ, অর্থাৎ জনগণের হাতের নগদ অর্থ এবং তফসিলি ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে বুঝি। অর্থাৎ M1 = CU + DD যেখানে M1 =সংকীর্ণ মুদ্রা CU = জনগণের কাছে রক্ষিত অর্থ এবং DD = ব্যাংকের চাহিদা আমানত। সংকীর্ণ মুদ্রার তারল্য সাধারণত বেশি থাকে।

১১। বিস্তৃত/প্রশস্ত মুদ্রা (Broad Money) : সংকীর্ণ মুদ্রা এবং ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের যোগফলকে বলা হয় বিস্তৃত মুদ্রা। অর্থাৎ M2 = M1 + TD = CU + DD + TD যেখানে, M2 = বিস্তৃত মুদ্রা TD = তফসিলি ব্যাংকের মেয়াদি আমানত।

১২। M3 বিস্তৃত মুদ্রার সাথে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী আমানত, স্বল্প তারল্য সম্পন্ন ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র, বিভিন্ন ধরনের বন্ড ইত্যাদি মিলে হয় M3। অর্থাৎ M3 = M2 + DL যেখানে, M2 = বিস্তৃত মুদ্রা, DL = দীর্ঘমেয়াদি স্থয়ী আমানত, স্বল্প তারল্যসম্পন্ন ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র, বিভিন্ন ধরনের বন্ড ইত্যাদি।

সংকীর্ণ মুদ্রা ও বিস্তৃত মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য (Different between M1 and M2) : সংকীর্ণ মুদ্রা ও বিস্তৃত মুদ্রার মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ রয়েছে।

১। সংকীর্ণ মুদ্রার তারল্য বিস্তৃত মুদ্রার তারল্যের চেয়ে বেশি। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং ফাংশনগত দিক থেকে সংকীর্ণ মুদ্রা বেশি জনপ্রিয়।

২। বিস্তৃত মুদ্রার মেয়াদি আমানতকে ভাঙিয়ে নগদ অর্থে রূপান্তর করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সংকীর্ণ মুদ্রায় এ ধরনের কোনো জটিলতা নেই।

৩। সংকীর্ণ মুদ্রার সমীকরণ, M1 = CU + DD; কিন্তু বিস্তৃত মুদ্রার সমীকরণ, M2 = M1 + TD = CU + DD + TD

৪। সংকীর্ণ মুদ্রা হচ্ছে বিস্তৃত মুদ্রার একটি অংশ মাত্র। এই সংকীর্ণ মুদ্রা দ্বারা বিস্তৃত মুদ্রা প্রভাবিত হয়। এরা একে অন্যের পরিপূরক।

৫। সংকীর্ণ মুদ্রার চেয়ে বিস্তৃত মুদ্রার জাতীয় আয়ের সাথে বেশি জড়িত। তাই আর্থিক নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সংকীর্ণ মুদ্রার চেয়ে বিস্তৃত/ব্যাপক মুদ্রাকেই বেশি পছন্দ করা হয়।

অর্থের কার্যাবলি (Functions of Money) :

আধুনিক অর্থনীতি একান্ত অর্থভিত্তিক। ফলে বর্তমান অর্থব্যবস্থায় অর্থ একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত। মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অর্থ প্রধানত তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে। যথা :

(ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি

(খ) সামাজিক কার্যাবলি এবং

(গ) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions)

অর্থের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোই বাণিজ্যিক কার্যাবলি। অর্থের প্রধান কার্যাবলি হলো :

"Money is a matter of functions, a medium, a measure, a standard, a store." অর্থাৎ অর্থের কাজ হলো চার–মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভাণ্ডার।

নিম্নে অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১। বিনিময়ের মাধ্যম : অর্থের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থই বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। তাই এর দ্বারা যেকোন পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়।

২। মূল্যের পরিমাপক : দ্রব্য বিনিময় প্রথায় মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদণ্ড না থাকায় বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু অর্থ সকল দ্রব্য, সেবা বা সম্পদের মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে বিধায় বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লেনদেন সহজতর হয়েছে।

৩। স্থগিত লেনদেনের মান : স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। দ্রব্যমূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল হলেও অর্থের মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। ঋণদাতা অর্থ দ্বারা ঋণদেয় এবং ঋণগ্রহীতা অর্থ দ্বারা তা পরিশোধ করে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে থাকে।

৪। সঞ্চয়ের বাহন : অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল ও ক্ষণস্থায়ী বলে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ দ্বারা সবকিছু ক্রয় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্যসামগ্রী বা সেবায় মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় হতে পারে।

৫। মূল্য স্থানান্তরের বাহন : অনেক দ্রব্যসামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজ ও নিরাপদে স্থানান্তর করা যায় না। যেমন– অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না, কিন্তু অর্থের মাধ্যমে তা বিক্রয় করে এর মূল্য সহজে দূরে স্থানান্তর করা যায়। এভাবে মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থসম্পদ ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

৬। ঋণের ভিত্তি : অর্থ ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমান কালে ব্যাবসায়িক লেনদেনের অধিকাংশ বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে।

৭। **তারল্যের মান :** অর্থ সবচেয়ে বেশি বিবেচিত হয় তরল সম্পদ হিসেবে। অর্থের তারল্য গুণের ফলে দ্রব্যসামগ্রীকে যেমন সহজেই অর্থে রূপান্তর করা যায়, তেমনই অর্থকে দ্রব্যসামগ্রীতে রূপান্তর করা যায়। এভাবে অর্থ তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে।

খ) সামাজিক কার্যাবলি (Social Functions)

অর্থ নানা সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। অর্থের সামাজিক কার্যাবলি বর্তমানে গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়। যেমন–

১। সামাজিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তার প্রতীক : সামাজে মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা দ্রব্যসামগ্রী ও সম্পদের আর্থিক মূল্যমানের দ্বারাই নির্ণীত হয়।

২। সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা : বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা উপহার-উপঢৌকন প্রদান করে অনেক সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করা যায়। এর ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

গ) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions) : আধুনিককালে অর্থ সামাজিক মর্যাদার বাহন হিসেবে কাজ করে। ধনী ব্যক্তিদের সমাজে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। এ ছাড়া নগদ অর্থ মানুষের মনোবল বাড়ায় এবং মানুষকে উৎফুল্ল রাখে। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বোধ বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুগত প্রগতি ত্বরান্বিত হয়। এভাবে অর্থ তার বিভিন্নমুখী ব্যবহার ও উপযোগ দ্বারা ব্যক্তিজীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা (Importance/Role of Money in the Modern Economy)

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ছাড়া কোনো দেশেরই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারে না। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। বিনিময়ের ক্ষেত্রে : অর্থ প্রচলনের ফলে বিনিময় ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়েছে। অর্থ বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এখন আর ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সামঞ্জস্যের দরকার হয় না। বর্তমানে অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

২। মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে : মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মাপকাঠি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অর্থ মূল্যের সাধারণ পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে সব দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

৩। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে : সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ তার আয়ের সবটাই বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করে না। সে এর কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা খুবই অসুবিধাজনক। এর জন্য মানুষ উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য অর্থের মাধ্যমে ধরে রাখে। এভাবে অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে এবং মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

৪। ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনা মেটানোর ক্ষেত্রে : অর্থ মানুষের ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনা মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সমাজে আর্থিক লেনদেন বেশির ভাগ ঋণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থের মূল্য সহজে পরিবর্তিত হয় না বলে মানুষ অর্থের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করে থাকে।

৫। উৎপাদন ক্ষেত্রে : আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কালে অর্থের মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যথা– ভূমি, শ্রম, কল-কারখানার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

৬। ভোগের ক্ষেত্রে : ভোগের ক্ষেত্রেও অর্থ গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে। অর্থ হলো সবচেয়ে তরল সম্পদ। যে কারণে ভোগকারী তার ইচ্ছামতো অর্থ দ্বারা যেকোনো দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে ভোগ করতে পারে।

৭। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে : আয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও অর্থের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আয় বণ্টনে সাহায্য করে। বস্তুত অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।

৮। মূল্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে : অর্থ প্রচলনের ফলে বর্তমানে সহজেই তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি এক স্থানে বিক্রি করে তার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে এবং এই অর্থ মূল্য দ্বারা অন্যত্র দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে।

৯। ব্যবসায় বানিজ্যের ক্ষেত্রে : অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থ সহজে বহনযোগ্য ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

১০। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে : রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রেও অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমে রাখা হয়। এর ফলে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা সহজ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকা অপরিসীম। অর্থকে কেন্দ্র করেই বর্তমান অর্থনৈতিক জগৎ আবর্তিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার বলেন, 'অর্থনীতিতে মানুষের সমাজ জীবনের ব্যবস্থায় বাণিজ্যসংক্রান্ত কার্যাবলির ক্ষেত্রে অর্থ একটি অনবদ্য আবিষ্কার, যাকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত।

এর গুরুত্ব সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ Golden Weiser-এর মত হলো, 'আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক পরিমাপ ও বণ্টন হয়তো দ্বিতীয় পর্যায়ে উপাদান বা কোনো উপাদান হিসেবেই বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক কল্যাণের রূপ সৃষ্টিতে অর্থ নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উপাদান।' অতএব বলা যায়, আধুনিক অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ

- দ্রব্যসামগ্রীর দাম অথবা অন্যান্য ব্যবসায়গত কার্যকলাপের পাওনা হিসাবে যা সাধারণত সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তা-ই অর্থ।
- সংকীর্ণ মুদ্রা হচ্ছে বিস্তৃত মুদ্রার একটি অংশ মাত্র। এই সংকীর্ণ মুদ্রা দ্বারা বিস্তৃত মুদ্রা প্রভাবিত হয়। এরা একে অন্যের পরিপূরক।

পাঠ ১১.২ অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand of & Supply for Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থের চাহিদার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ জানতে পারবেন;
- অর্থের যোগান ও যোগানের উপাদানসমূহ বুঝতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

দৈনন্দিন সকল কর্মকাণ্ডে অর্থের প্রয়োজন। ব্যাবসায়িক লেনদেন, পারিবারিক জীবন নির্বাহ, মূল্যের সংরক্ষক, সঞ্চয় সৃষ্টি প্রভৃতি সকল কাজে অর্থ একমাত্র হাতিয়ার, এজন্যই যেকোনো মানুষই কমবেশি অর্থের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। আবার সঞ্চয় আকারেও অর্থ জমা রাখতে পারে। নগদ অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছাকে অর্থের চাহিদা বলে।

এ প্রসঙ্গে D G Pierce & D M Show বলেন, 'অর্থের চাহিদা বলতে আমরা দ্রব্য ও সেবা ক্রয়, আর্থিক সম্পদ ক্রয়, অন্যকে দান করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার বুঝি না, বরং ধরে রাখাকে বুঝি।'

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের চাহিদা বলা হয়। অর্থের নিজস্ব কোনো উপযোগ নেই। অর্থ দ্রব্যসামগ্রীর মতো সরাসরি ভোগও করা যায় না। কেবলমাত্র দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার উদ্দেশ্যেই অর্থের চাহিদা হয়। অর্থ হলো বিনিময়ের মাধ্যম। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য অর্থের বিনিময়ে বেচাকেনা হয় তা-ই অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে। সুতরাং অর্থের মোট চাহিদার পরিমাণ দেশে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মোট মূল্যের সমান। যদি সমাজে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং যদি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তাহলে অর্থের চাহিদা কম হবে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ স্থির থাকে। তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না।

অর্থের চাহিদার বিভিন্ন ধারণা (Different concepts of Money demand)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের চাহিদা বলে। মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে অর্থের চাহিদাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১। অর্থের লেনদেনজনিত চাহিদা (Transitory Demand for Money)

২। অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা (Precautionary Demand for money)

৩। অর্থের ফটকা চাহিদা (Speculative Demand for Money)

অর্থের লেনদেনজনিত চাহিদা (Transitory Demand for Money) :

দৈনন্দিন লেনদেন, দ্রব্য ও সেবার কেনাবেচা এবং যেকোনো প্রকার আদান-প্রদানে অর্থ ব্যবহৃত হয়। এসব প্রয়োজনে ব্যবহৃত অর্থের চাহিদাকে অর্থের লেনদেন চাহিদা বলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য মানুষ যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের লেনদেন চাহিদা বলা হয়। অর্থের লেনদেন চাহিদা মূলত আয়ের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে আয়ের সাথে অর্থের লেনদেন চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ আয় বাড়ালে অর্থের লেনদেন চাহিদা বাড়ে। লেনদেন চাহিদাকে নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$M1= f(Y)= kY; dM/dY = k>0$

যেখানে, M1 = অর্থের লেনদেন চাহিদা, Y= আয়, k= একটি ধনাত্মক ধ্রুবক।

k-এর মান ধনাত্মক দ্বারা বোঝায় আয়ের সাথে লেনদেনের চাহিদা সম্পর্ক ধনাত্মক।

অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা (Precautionary Demand for Money) :

ভবিষ্যতে কোনো অনিশ্চিত বা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সতর্কতা হিসেবে বর্তমানে মানুষ কিছু নগদ হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থের এরূপ চাহিদাকে সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। যেমন–ভবিষ্যতে অসুস্থতা, ব্যবসায়ে ক্ষতি, চাকরিচ্যুতি কিংবা অনুরূপ কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে। এ ধরনের আশংকায় সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়। সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভর করে। আয়ের সাথে সতর্কতামূলক চাহিদা সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে আয় বাড়লে সতর্কতামূলক অর্থে চাহিদা বাড়ে। সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাকে নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$Mp= f(Y), dMp\div dY> 0$

যেখানে, Mp= সতর্কতামূলক অর্থেও চাহিদা

Y = আয়

অর্থের ফটকা চাহিদা (Speculative Demand for Money) :

দৈনন্দিন লেনদেন ও ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলা ছাড়াও মানুষ ফটকা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। ফটকা উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগত অর্থ মানুষ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের ফটকা চাহিদা বলে। যেমন– মানুষ ঋণপত্রে টাকা খাটিয়ে কিছু বাড়তি অর্থ উপার্জন করতে চায়। ঋণপত্রের দাম (সুদের হার) বেশি হলে মানুষ ঋণপত্র ক্রয় করে। সে ক্ষেত্রে নগদ অর্থের পরিবর্তে মানুষ ঋণপত্র হাতে রাখে, অর্থাৎ নগদ অর্থের চাহিদা কমে। আবার বিপরীত অবস্থায় নগদ অর্থের চাহিদা বাড়ে। অর্থের এ ধরনের চাহিদাকে বলা হয় অর্থের ফটকা ব্যবসায় জনিত চাহিদা। অর্থের ফটকা চাহিদা নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সুদের হার বাড়লে অর্থের ফটকা চাহিদা কমে। আবার সুদের হার কমলে অর্থের ফটকা চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ সুদের হারের সাথে অর্থের ফটকা চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত। অর্থের ফটকা চাহিদাকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$Ms = f(ri); dMs/ dr1<0$

যেখানে, Ms= অর্থের ফটকা চাহিদা, ri= সুদের হার।

অর্থের চাহিদা নির্ধারক (Determinants of Demand for Money) :

নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছাকে অর্থের চাহিদা বলে। অর্থের চাহিদা যে সকল উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় সেগুলোকে বলা হয় অর্থের চাহিদার নির্ধারক। নিম্নে অর্থের চাহিদার নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

১। আয় : আয়ের ওপর অর্থের চাহিদা বিশেষভাবে অর্থের লেনদেন ও সতর্কতামূলক চাহিদা নির্ভর করে। আয় বেশি হলে অর্থের চাহিদা বেশি হয় এবং আয় কম হলে অর্থের চাহিদা কম হয়।

২। ভোগপ্রবণতা : ভোগপ্রবণতা অর্থের লেনদেন চাহিদাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। ভোগপ্রবণতা বেশি হলে নগদ অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। আবার ভোগপ্রবণতা কম হলে নগদ অর্থের চাহিদা কমে।

৩। আয়প্রাপ্তির ধরন : আয় উপার্জন বা প্রাপ্তির মেয়াদের ওপর নগদ অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। আয় প্রাপ্তির মেয়াদ বেশি হলে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার প্রবণতা বেশি হয়। আবার আয়প্রাপ্তির মেয়াদ কম হলে অর্থের চাহিদা কম হয়।

৪। সঞ্চয়প্রবণতা : মানুষের সঞ্চয়প্রবণতা নগদ অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সঞ্চয়প্রবণতা বেশি হলে অর্থের চাহিদা কম হয়। আবার সঞ্চয়প্রবণতা কম হলে অর্থের চাহিদা বেশি হয়।

৫। সুদের হার : সুদের হারের ওপর অর্থের চাহিদা বিশেষ করে অর্থের ফটকা চাহিদা নির্ভর করে। সুদের হার কমলে অর্থের ফটকা চাহিদা বাড়ে। আবার সুদের হার বাড়লে অর্থের ফটকা চাহিদা কমে।

৬। মুদ্রা বাজার : অর্থের চাহিদা মুদ্রা বাজারের ওপর নির্ভর করে। মুদ্রা বাজার উন্নত হলে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার প্রবণতা মানুষের কমে যায় তথা অর্থের চাহিদা কমে যায়। আবার মুদ্রা বাজার অনুন্নত হলে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৭। দাম স্তর : দাম স্তর নগদ অর্থের চাহিদা অনেকাংশে প্রভাবিত করে। দাম স্তর বাড়তে থাকলে তথা মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থের চাহিদা বাড়ে। আবার দাম স্তর কমতে থাকলে তথা মুদ্রা সংকোচনের সময় অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়।

৮। প্রত্যাশা : প্রত্যাশা অর্থের চাহিদাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা, আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা, ব্যবসায়ের লোকসানের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় নগদ অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

৯। ব্যাংক ব্যবস্থা : উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা নগদ অর্থের চাহিদাকে বর্তমান কালে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের ফলে নগদ অর্থ হাতে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে ব্যাংক ব্যবস্থা অনুন্নত ও ব্যাংকিং সুবিধা কম থাকলে মানুষ বাধ্য হয়ে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখে।

১০। সামাজিক নিরাপত্তা : সামাজিক নিরাপত্তা অর্থের চাহিদাকে বিশেষ করে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সামাজিক নিরাপত্তা থাকলে বর্তমানে লেনদেন চাহিদা বাড়ে, ভবিষ্যৎতের জন্য অর্থ জমা রাখার প্রবণতা কমে। আবার সামাজিক নিরাপত্তার অভাব হলে বর্তমানে লেনদেন চাহিদা কমে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা রাখার প্রবণতা বাড়ে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো দ্বারা একটি দেশের অর্থের চাহিদা প্রভাবিত হয়। উক্ত বিষয়গুলো অনুকূল পরিবর্তন হলে অর্থের চাহিদা বাড়ে এবং প্রতিকূল পরির্তন হলে অর্থে চাহিদা কমে।

অর্থের যোগান (Supply of Money)

কোনো দেশে সরকার কর্তৃক প্রচলিত সকল প্রকার মুদ্রার সমষ্টিকে সাধারণ অর্থের যোগান বলা হয়। প্রচলিত মুদ্রা বলতে বাজার চালুর সকল প্রকার কাগজের নোট ও ধাতব মুদ্রার সমষ্টিকে বোঝায়। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের চাহিদা আমানতে জমা অর্থ ও প্রচলিত মুদ্রা অন্তর্ভুক্ত। কারণ অর্থ জমাদানকারী চাহিদামাত্র চাহিদা আমানতের অর্থ পেতে পারে। কাজেই প্রচলিত অর্থ ও আমানতের সমষ্টিকে যোগান বলা হয়। অবশ্য মেয়াদি আমানতে রাখা অর্থ পরিমাণকে ও বর্তমান কালে অর্থ যোগান বলা হয়। অবশ্য মেয়াদি আমানত রাখা অর্থের পরিমাণকে ও বর্তমান কালে অর্থ যোগানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ অর্থ সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়।

অধ্যাপক Milton Friedman ও তাঁর অনুসারীরা অর্থ সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝান।

সূত্রানুসারে Ms = DD+Cu+TD.....(ও)

এ ক্ষেত্রে, Ms = অর্থ সরবরাহ

DD = ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত

C = জনগণের হাতের কারেন্সি এবং

TD = মেয়াদি আমানত।

অধ্যাপক জে জিগার্লি (J G Gurley) এবং E S Shaw অর্থ সরবরাহকে ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করেন। তাঁদের মতে, অর্থ সরবরাহ হলো জনগণের হাতের মুদ্রা, চাহিদা আমানত এবং বন্ড ও শেয়ারের সমষ্টি।

সুতরাং Ms = DD+Cu+TD+ma .....(ii)

এ ক্ষেত্রে, ma = অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, যা DD, Cu, TD-এর বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে বন্ড, পোস্টাল অর্ডার, শেয়ার ইত্যাদি আর্থিক সম্পদ বোঝায়। তবে সাধারণ ফাংশনগত দিক হতে অর্থ সরবরাহ বলতে,

Ms = DD+Cu .....(iii)-কে বোঝায়।

উপরের তিনটি ধারণার মধ্যে ফাংশনগত দিক থেকে (iii) নং বিশ্লেষণাত্মক এবং নীতি-নির্ধারণের দিক থেকে (i) ও (ii) নং সমীকরণ বিবেচনা করা যায়। তবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) (iii) নং কে সংকীর্ণ এবং (i) নং কে বিস্তৃত অর্থে অর্থ সরবরাহের ধারণা হিসেবে ব্যবহার করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অর্থে যোগানের উপাদান হচ্ছে চারটি। যথা :

১. কাগজের নোট বা কারেন্সি নোট (Paper Currency)

২. ধাতব মুদ্রা (Coin Money)

৩. চাহিদা আমানত (Demand Deposit) এবং

৪. মেয়াদি আমানত (Time Deposit)

নিম্নে অর্থের যোগানের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

১। কাগজের নোট বা কারেন্সি নোট : একটি সময় কোনো দেশে সরকার এবং সরকার থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল প্রকার কারেন্সি নোট অর্থে যোগানের অন্তর্ভুক্ত। সকল দেশে কারেন্সি নোট অর্থের যোগানের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

২। ধাতব মুদ্রা : সরকার জনগণের লেনদেনের সুবিধার্থে বাজারে ধাতব মুদ্রা ইস্যু করে। এসব ধাতব মুদ্রা অর্থের যোগানের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। চাহিদা আমানত : চাহিদা আমানত বলতে ব্যাংকে জমাকৃত গ্রাহকদের আমানতকে বোঝায়, যে আমানতের টাকা চাহিবামাত্র গ্রাহকদেরকে ব্যাংক দিতে বাধ্য থাকে, এ ধরনের আমানত যারা ব্যাংকে রাখে তা যেকোনো সময় নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় এবং লেনদেনের কাজেও চেক ইস্যু ব্যবহার করা যায়। যেমন– যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে চেক ইস্যু করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেনদেন করে। তাছাড়া বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনেক দেশে চেকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সূত্রাকারে, DD=Ms-(Cu+TD) অর্থাৎ মোট সরবরাহ থেকে জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি বাদ দিলে চাহিদা আমানত পাওয়া যায়।

৪। মেয়াদি আমানত : যেহেতু চাওয়ামাত্র দেনা পরিশোধের কাজে এই অর্থ ব্যবহার করা যায় না। তাই সংকীণ অর্থে না হলেও বিস্তৃত অর্থের মেয়াদ আমানত অর্থ সরবরাহের উপাদান হিসেবে গণ্য হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে টাকা উঠানো যায় না তাকে মেয়াদি আমানত বলে। মোট অর্থ সরবরাহ (M) থেকে চাহিদা আমানত (DD) এবং জনগণের হাতের মুদ্রা (CU) বাদ দিলে যা থাকে, তাকে মেয়াদি আমানত (TD) বলা হয়।

অতএব, TD = Ms- (Cu+DD)

অর্থাৎ Ms = Cu+DD+TD

অর্থের যোগানের নির্ধারক (Determinants of Supply of Money)

একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ কারেন্সি, চাহিদা আমানত, মেয়াদি আমানত ও বন্ধক থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় অর্থের যোগান। অর্থের যোগান বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেগুলোকে বলা হয় অর্থের যোগদানের নির্ধারক। নিম্নে অর্থের যোগানের নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো।

১। কাগজি ও ধাতব মুদ্রা : কাগজি ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ বাড়লে অর্থের যোগান বাড়ে। আবার কাগজি ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ কমলে অর্থের যোগান কমে।

২। মেয়াদি আমানত : মেয়াদি আমানত বাড়লে চাহিদা আমানত কমে এবং অর্থের যোগানও কমে। আবার মেয়াদি আমানত কমলে চাহিদা আমানত বাড়ে এবং অর্থের যোগানও কমে।

৩। রিজার্ভ অনুপাত : বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিজার্ভ অনুপাত বাড়লে বা কমলে অর্থের যোগান যথক্রমে কমে বা বাড়ে।

৪। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ : দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়লে অর্থের যোগান বাড়ে। আবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমলে অর্থের যোগান কমে।

৫। বৈদেশিক ঋণ : বৈদেশিক ঋণের নীতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি এবং হ্রাস পায়।

৬। ঘাটতি ব্যয় নীতি : অর্থনীতিতে সরকার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে, বিশেষ করে ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করলে অর্থের যোগান বাড়ে। আবার সরকার ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করলে অর্থের যোগান কমে।

৭। ঋণনীতি : সরকার ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে সম্প্রসারণমূলক ঋণনীতি গ্রহণ করলে বাজারে অর্থের যোগান বাড়ে। আবার সংকোচনমূলক ঋণনীতি গ্রহণ করলে অর্থের যোগান কমে।

উপরিউক্ত উপাদানগুলোর অনুকূল পরিবর্তনে অর্থের যোগান বাড়ে এবং প্রতিকূল পরিবর্তন হলে অর্থের যোগান কমে।

সারসংক্ষেপ

- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের চাহিদা বলে।
- অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে আয়ের সাথে অর্থের লেনদেন চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক।
- অর্থ সরবরাহ হলো জনগণের হাতের মুদ্রা, চাহিদা আমানত এবং বন্ড ও শেয়ারের সমষ্টি।

পাঠ ১১.৩ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থের পরিমাণের ফিশারীয় তত্ত্ব শিখতে পারবেন;
- অর্থের পরিমাণের ক্যামব্রিজের তত্ত্ব শিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের মূল্য তত্ত্ব (Theory of Value of Money)

সাধারণত অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকেই অর্থের মূল্য বলা হয়। অর্থের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। দ্রব্যমূল্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই আমরা সাধারণত আমরা দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।

অর্থের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

জে এল. হ্যান্সেনের মতে, 'অর্থ যা ক্রয় করে তা-ই অর্থের মূল্য।'

ডি এইচ রবার্টসনের মতে, 'এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণত যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায় তা-ই অর্থের মূল্য।'

কে কে কুরিহারার মতে, 'অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য বলতে অভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বুঝায় এবং অর্থের বহিঃস্থ অর্থ বলতে অর্থের বৈদেশিক বিনিময় হার বোঝায়।'

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়। অর্থের মূল্য মূলত দাম স্তরের ওপর নির্ভর করে। দাম স্তরের সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক। অর্থাৎ দাম স্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং দাম স্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। দাম স্তরের সাথে অর্থের মূল্যের এই বিপরীত সম্পর্ক নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$Vm = f(P) = 1/P$

যেখানে, Vm = অর্থের মূল্য এবং P = দাম স্তর

অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মূল্য (Internal and External Value of Money) : অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় অর্থের মূল্য। অর্থনীতিবিদ রবার্টসন বলেন, 'অর্থের নির্দিষ্ট এককের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায়, তাকে অর্থের মূল্য বলে।'

নগদ লেনদেনের তত্ত্ব : ফিশারীয় ভাষ্য

Cash Transaction Theory : Fisher's Approach

বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ Irving Fisher ১৯১১ সালে প্রকাশিত " The Purchasing Power of Money" গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অর্থের পরিমাণ, দাম স্তর এবং অর্থের মূল্যের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য একটি সমীকরণ ব্যবহার করেন। তাঁর নামানুসারে এই সমীকরণটিকে ফিশারের সমীকরণ বলা হয়। এই

সমীকরণে ফিশার অর্থকে শুধুমাত্র লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই এই সমীকরণটি লেনদেন সমীকরণ (Transaction Equation) নামেও পরিচিত। ফিশারের সমীকরণ নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

উক্ত সমীকরণের দুটি অংশ। যথা : অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান। M-কে V দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় অর্থের যোগান (MV)। আবার P-কে T দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যায় অর্থের চাহিদা (PT)। অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের সমতার মাধ্যমে অর্থ মূল্য নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে ফিশারের বিনিময় সমীকরণে। তবে উপরোক্ত সমীকরণে আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে যেমন–চেক, ব্যাংক ড্রাফট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন বন্ড ও সঞ্চয়পত্রের কথা বলা হয়নি। অথচ এগুলো লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তাই পরবর্তীতে ফিশারের সমীকরণ সম্প্রসারণ করে নিম্নোক্তভাবে লেখা হয়েছে,

অনুমিত শর্ত (Assumptions)

ফিশারের লেনদেন তথ্যটি নিম্নোক্ত অনুমিত শর্তগুলো বিবেচনা করে।

১. পূর্ণ নিয়োগ অর্থনীতির বিবেচ্য

২. অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে

৩. স্বল্পকালে মোট লেনদেনের পরিমাণ স্থির থাকবে

৪. দ্রব্যের দাম বা মূল্যস্তর (P) একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান

৫. স্বল্পকালে অর্থের প্রচলন গতি (V) স্থির।

মূল বক্তব্য : অন্যান্য দ্রব্যের দামের মতো অর্থের মূল্য তার চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে, অর্থের মূল্য সেই একই হারে কম এবং অর্থের যোগান যে হারে কমে, অর্থের মূল্য সেই একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্য কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। অন্যদিকে অর্থের যোগানের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক সমানুপাতিক। তাই অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে দাম স্তর দ্বিগুণ হয়।

উপরোক্ত উদাহরণ হতে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অবস্থায় স্থির রেখে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে দাম স্তরের দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবার বিপরীত দিকে অর্থের পরিমাণকে কমিয়ে অর্ধেক করা হলে দাম স্তর কমে অর্ধেক হয়ে যায়।

সমালোচনা (Criticism)

অর্থের মূল্য নির্ধারণে ফিশারের তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর বিভিন্ন সমালোচনা বা ত্রুটি রয়েছে। যেমন :

১। ফিশারের লেনদেন সমীকরণে ধরে নেয়া হয়েছে, যে অর্থ কেবলমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই ধারণাটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া, অর্থ সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণ পরিশোধের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যা এ তত্ত্বে আলোচনা করা হয়নি।

২। ফিশারের লেনদেন তত্ত্বের অর্থের মূল্য নির্ধারণে অর্থের যোগানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি অর্থের চাহিদার দিককে উপেক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু অর্থের মূল্য নির্ধারণে অর্থের চাহিদারও ভূমিকা রয়েছে, যা পরবর্তীতে ক্যামব্রিজ সমীকরণে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

৩। দাম তো শুধুমাত্র অর্থের যোগানের ওপর নির্ভর করে না বরং আয় স্তর, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় দ্বারাও দাম স্তর প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ফিশার ব্যর্থ হয়েছে।

৪। ফিশারের তত্ত্বে বাণিজ্যচক্রের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অথচ বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতনের সময় অর্থের যোগান স্থির থাকলেও দাম স্তর বাড়ে কিংবা কমে।

৫। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দাম স্তর বাড়ে এবং অর্থের পরিমাণ কমলে দাম স্তর কমে। কিন্তু বাস্তবতা হলো অর্থের পরিমাণ স্থির থাকলেও দাম স্তর বা কমতে পারে।

৬। ফিশারের সমীকরণে ধরে নেয়া হয়েছে যে স্বল্পকালে অর্থ প্রচলন গতি বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৭। লেনদেন সমীকরণে অর্থের পরিমাণ ও দাম স্তরের যে সমানুপাতিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক নয়। কারণ সমাজে যদি অব্যবহৃত সম্পদ থাকে তাহলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে মূল্যস্তর আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না।

৮। সমাজে পূর্ণ নিয়োগ স্তর বজায় থাকলেই কেবল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মূল্যস্তর বাড়ানো যায়। তাই ফিশার পূর্ণ নিয়োগ অর্থনীতি বিবেচনা করেছেন। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ বাস্তবে অসম্ভব। তাই ফিশারের তত্ত্বের কার্যকারিতাও সীমাবদ্ধ।

৯। ফিশারের সমীকরণ মূলত অর্থের যোগান এবং অর্থের চাহিদার সমতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ MV=PT। কিন্তু অর্থের চাহিদার সাথে অর্থের যোগানের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কি না তার কোনো ব্যাখ্যা উক্ত সমীকরণে নেই। তাই বলা হয়, ফিশারের সমীকরণ একটি নিছক অভেদ মাত্র।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলো থাকা সত্ত্বেও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ফিশারের লেনদেন তত্ত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ অর্থের যোগান দ্বারা দাম স্তর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়–এই কথাটি মাথায় রেখে দেশের নীতি-নির্ধারকগণ নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন।

ফিশারের সমীকরণ কি একটি অভেদ?

Is Fisher's Equation an Identity?

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের সমতার মাধ্যমে অর্থের মূল্য নির্ধারণের যে সমীকরণ ব্যবহার করেন তাই বিনিময় সমীকরণ নামে পরিচিত। ফিশারের বিনিময় সমীকরণ নিম্নরূপ :

উপরোক্ত সমীকরণ ব্যাখ্যা করার জন্য অফিসার বেশ কয়েকটি অনুমিত শর্তগুলো নেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

১। অর্থ কেবলমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। T ও V অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান।

উক্ত অনুমিত শর্তগুলো মেনে নিলে অর্থের মূল্য নির্ভর করে শুধুমাত্র অর্থের যোগানের ওপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দাম স্তর দ্বিগুণ হবে; কিন্তু অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। বিষয়টা তো পূর্বনির্ধারিত স্বতঃসিদ্ধের মতোই। কেননা সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে অর্থের যোগান বাড়লে দাম স্তর তো বাড়বেই। এখানে তো নতুন কিছু নেই। তাছাড়া অর্থের চাহিদার সাথে অর্থের যোগানের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক ও উক্ত সমীকরণের ব্যাখ্যা করা হয়নি। সুতরাং MT = PT সমীকরণটি নিছক একটি অভেদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

নগদ মজুদ তত্ত্ব : ক্যামব্রিজ সমীকরণ

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল, পিগু, জে এম কেইন্স এবং ডি এইচ রবার্টসন প্রমুখ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁদের সকলেই ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং মূল বক্তব্য একই রকম হওয়াতে তাঁদের ব্যবহৃত সমীকরণকে ক্যামব্রিজ সমীকরণ বলা হয়। তাঁদের মতে, শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণ দ্বারা দাম স্তর প্রভাবিত হয় না বরং নগদ অর্থ হাতে রাখার প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। দৈনন্দিন লেনদেন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ তাঁদের যে অংশ নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায় তা-ই নগদ তহবিল বা নগদ ব্যালেন্স নামে পরিচিত। ক্যামব্রিজ অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন, অর্থ মূল্য নির্ধারণে অর্থের যোগানের পাশাপাশি অর্থের চাহিদা বা নগদ তহবিল ভূমিকা পালন করে। তাই ক্যামব্রিজ সমীকরণকে নগদ ব্যালেন্স সমীকরণ বলা হয়।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতিবিদগণের প্রদত্ত সমীকরণগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত সমীকরণ হচ্ছে রবার্টসনের সমীকরণ। রবার্টসনের সমীকরণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

উপরোক্ত সমীকরণের বামপক্ষ হচ্ছে অর্থের যোগান এবং P ও T-এর গুণফল হচ্ছে অর্থের চাহিদা। অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের সমতার মাধ্যমে অর্থের মূল্য নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। উক্ত সমীকরণ থেকে দুই ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। প্রথমত, অর্থের পরিমাণের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক ধনাত্মক এবং অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ঋণাত্মক। অর্থাৎ K এবং T স্থির থেকে M বাড়ালে দাম স্তর বাড়ে; কিন্তু অর্থের মূল্য (Vm) কমে।

দ্বিতীয়ত, নগদ মজুদ কিংবা অর্থের চাহিদার সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক বিপরীত; কিন্তু অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ নগদ মজুর বাড়লে দাম স্তর কমে; কিন্তু অর্থের মূল্য বাড়ে।

নগদ মজুর তত্ত্বের সমালোচনা : ক্যামব্রিজ সমীকরণের বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন :

১। ক্যামব্রিজ সমীকরণে K এবং T কে স্থির ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে K-এর মান স্থির থাকে না এবং T অবশ্যই পরিবর্তনশীল। যদি K এবং T পরিবর্তনশীল হয় তবে অর্থের পরিমাণের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক কীরূপ হবে তার কোনো ব্যাখ্যা ক্যামব্রিজ সমীকরণে নেই।

২। নগদ মজুর তত্ত্বের বাণিজ্যচক্রের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অথচ বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধি ও মন্দার সময় অর্থের পরিমাণ স্থির থাকলেও দাম স্তর বাড়তে বা কমতে পারে।

৩। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দাম স্তর বাড়ে এবং অর্থের পরিমাণ কমলে দাম স্তর কমে। কিন্তু কেন অর্থের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে দাম স্তর বাড়ে কিংবা কমে তার কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

৪। ক্যামব্রিজ সমীকরণে অর্থের মূল্য ও দাম স্তর নির্ধারণে অর্থের চাহিদা ও মজুদের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থের চাহিদা বলতে এখানে শুধুমাত্র লেনদেন চাহিদার কথা বলা হয়েছে; ফটকা অর্থের চাহিদার কথা বলা হয়নি। অথচ অর্থের ফটকা চাহিদা সুদের হারকে প্রভাবিত করে এবং সুদের হার নগদ মজুদকে প্রভাবিত করে। ক্যামব্রিজ সমীকরণে এই বিষয়টা স্থান পায়নি। তাই ক্যামব্রিজ সমীকরণ একটি সংকীর্ণ তত্ত্ব।

৫। অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান ছাড়া আয়স্তর, সঞ্চয় প্রবণতা, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় দ্বারাও দাম স্তর প্রভাবিত হতে পারে। সেই বিষয়গুলো ক্যামব্রিজ সমীকরণে বলা হয়নি।

৬। ক্যামব্রিজ সমীকরণে K-এর নির্ধারক হিসেবে প্রকৃত আয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত আয় ছাড়া K আরো অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন–আয়স্তর, ভোগপ্রবণতা, সুদের হার, আয় বণ্টন, প্রত্যাশা ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

- দাম স্তরের সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক। অর্থাৎ দাম স্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং দাম স্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে;
- দৈনন্দিন লেনদেন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ তাদের যে অংশ নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায় তাই নগদ তহবিল বা নগদ ব্যালেন্স নামে পরিচিত।

পাঠ ১১.৪ মুদ্রাস্ফীতি
Inflation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন;
- মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ জানতে পারবেন;
- মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অনুভব করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মুদ্র্যস্ফীতি (Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ক্রাউথারের মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি অবস্থা, যখন অর্থের মূল্য ক্রমেই কমে, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বাড়ে।'

কুলবর্ণের মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি, যেখানে অত্যধিক অর্থ অল্প দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয়।'

অধ্যাপক পিগুর মতে, 'যখন উৎপাদনশীলকার্য অপেক্ষা আর্থিক আয় বেশি হারে বৃদ্ধি পায়, তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।'

কেইনসের মতে, 'পূর্ণ নিয়োগক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে মোট চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা যদি দাম স্তর বাড়ে, তবে তাই হবে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি।' মুদ্রাস্ফীতির বেশকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি কি এ প্রশ্নের সোজাসুজি একটি উত্তর (সংজ্ঞা) প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতির যথাসম্ভব সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো, 'সাধারণ দাম স্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।'

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

মুদ্রাস্ফীতির সাধারণ কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি : বাণিজ্যিক ব্যাংকঋণের প্রসার ঘটাতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ব্যাংক হারের হ্রাসসহ বিভিন্ন অনুকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেশি ঋণ দিতে পারে। বাড়তি ঋণের দ্বারা অর্থের যোগান বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন যদি তার সঙ্গে সংগতি রেখে না বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. ঘাটতি অর্থ সংস্থান : উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকারকে ঘাটতি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। নোট ছাপিয়ে বা ঋণ গ্রহণ করে যখন সরকার প্রকল্প ব্যয় নির্বাহ করে, তখন দাম স্তর বেড়ে যায়।

৩. যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ : যুদ্ধের সময় সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। তখন কাগজি নোট বেশি ছাপানো হয়। যুদ্ধের সময় ভোগ্যশিল্প থেকে যুদ্ধশিল্পে কাঁচামাল ও মূলধন স্থানান্তরিত হয়। ফলে দাম স্তর বাড়ে।

৪. অর্থের প্রচলন গতির বৃদ্ধি : দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে তথা সমাজে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা বাড়লে অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে। ফলে দাম স্তর বাড়ে, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৫. ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব : শ্রমক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রমিক কল্যাণ বিবেচনা করে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা প্রায়ই মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানান। তখন মালিকরা মজুরি বাড়াতে বাধ্য হলে দাম স্তর বাড়ে। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৬. মূল্যবান ধাতব পদার্থের যোগান বৃদ্ধি : মূল্যবান ধাতব পদার্থ যেমন 'দক্ষিণ আমেরিকার নতুন বিশ্ব' আবিষ্কৃত হওয়ার পর স্পেনীয়দের দ্বারাই ইউরোপের সর্বত্র ধাতব পদার্থের যোগান বেড়ে গিয়েছিল, তখন তার দ্বারা দাম স্তরও বেড়ে গিয়েছিল।

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা : প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দিলে ও প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে যোগান ক্ষতিগ্রস্ত হলে দাম স্তর বাড়ে।

প্রসারিত দৃষ্টিতে কারণগুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা যায়–চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ভোগ ও বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধি এসবের দ্বারা সমাজের চাহিদা বাড়তে পারে। তখন দাম স্তর বাড়ে।

সামগ্রিক যোগান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তথা যোগান শকসের কারণে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীত দেখা দেয়। শ্রমিক ইউনিয়ন বেশি মজুরি দাবি করলে, একচেটিয়া কারবারির মুনাফার প্রত্যাশা বেড়ে গেলে এবং সম্পদের যোগান-দাম আকস্মিক বেড়ে গেলে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রভাব

উৎপাদন ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব : উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় ধীরগতিতে যদি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তবে তা ক্ষতিকর নয়। ধীরে ধীরে দাম স্তর বাড়লে অব্যবহৃত সম্পদ নিয়োগের সম্ভাবনা বাড়ে। প্রাপ্তির প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করে উৎপাদকগণ উৎপাদন বাড়ায়। কাজেই মৃদু মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বিনিয়োগের সহায়ক। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারের সমতাস্থলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা নির্ভর করে মূলধনের যোগান দাম ও মূলধন থেকে প্রত্যাশিত আয়ের ওপর। সুদের হার নির্ভর করে অর্থ বাজারের প্রক্রিয়ার ওপর। মুদ্রাস্ফীতি চলাকালে যদি অনুমান করা যায় মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা সূচি অপরিবর্তিত থাকবে এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রকৃত সুদের হার কমবে, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে।

উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব : দেশে উল্লম্ফন বা অতি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে উৎপাদন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন– (১) ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভের আশায় ফটকা বাজারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রকৃত উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। (২) অলস-জমার (hoarding) প্রতি জনগণ উৎসাহী হয়। (৩) কালোবাজারি প্রসারিত হয়। (৪) সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমে, মূলধন গঠন বিঘ্নিত হয়। (৫) বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ কমে। (৬) বিলাসসামগ্রীর ব্যয়ের প্রবণতা বাড়ে।

বণ্টন ক্ষেত্রে প্রভাব

১. নির্দিষ্ট বেতনভোগী : মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের প্রকৃত আয় কমে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যায়।

২. শ্রমিক শ্রেণি : তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাম স্তর বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরি বাড়ে না। মজুরি বাড়লে দাম স্তর আরো বেড়ে যায়। তবে দেশে ধীরগতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে বেকার শ্রমিকদের নিয়োগ পাবার সম্ভাবনা থাকে।

৩. কৃষক শ্রেণি : ভূমিহীন কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের কমে যায়। কিন্তু ধনী কৃষকরা লাভবান হয়। কারণ খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে তারা লাভবান হয়। উৎপাদন ব্যয় যে হারে বাড়ে, তার তুলনায় ফসলের দাম বেশি হলে তারা লাভবান হয়।

৪. উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী শ্রেণি : তারা লাভবান হয়। কারণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ এনে দেয় মুদ্রাস্ফীতি। উৎপাদন খরচের তুলনায় উৎপন্ন সামগ্রীর দাম বাড়লে তাদের সুবিধা হবে। অবশ্য অতি-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সেই লাভ বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না।

৫. বিনিয়োগকারী : তাদের মধ্যে কারো লাভ, কারো ক্ষতি। যারা কোম্পানির (উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের) শেয়ার কেনে, মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় কোম্পানির লাভ হলে তারাও লাভবান হয়। অপরদিকে যারা বন্ড বা সঞ্চয়পত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে, তারা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদসহ যে অর্থ বন্ডের বা সঞ্চয়পত্রের মালিকরা পায়, মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার মূল্য কমে যায়।

৬. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা : ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। ঋণদাতা যখন ঋণ প্রদানের পর নির্দিষ্ট সময়ান্তে আসল ও সুদ পায়, মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার মূল্য আগের চেয়ে কমে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা যখন নির্দিষ্ট সময়ান্তে আসল ও সুদ পায়, মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার মূল্য আগের চেয়ে কমে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা যখন নির্দিষ্ট সময়ের শেষে অর্থ ফেরত দেয়, তখন তার মূল্য তার নিকট কমে যাবার কারণে সে লাভবান হয়।

৭. করদাতা : তারা লাভবান হয়। কারণ করের পরিমাণ পূর্বের মতো থাকলে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই কর বাবদ প্রদেয় অর্থের মূল্য কর প্রদানকারীর নিকট কম অনুভূত হয়।

আলোচনা থেকে দেখা যায়, মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা কেউ লাভবান এবং কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সার্বিকভাবে বলা যায় যে. সামজের বণ্টনক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির কারণে অসমতা দেখা দেয় ।

মুদ্রাস্ফীতির সামাজিক ফলাফল

সমাজের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক। কারণ মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে ভোগ কমে যায়। ফলে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই অসন্তোষ পরবর্তীতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন যখন মুদ্রাস্ফীতির কারণে ন্যূনতম জীবন যাপন করতে পারে না, তখন নানা প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় তারা নেয়। নৈতিকতার অবক্ষয় দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সামাজিক শ্রেণিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দেয়, তা সমাজ কাঠামোকে বিপন্ন করে তোলে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় (Measures to Control Inflation)

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। ক. আর্থিক পদ্ধতি, খ. রাজস্ব পদ্ধতি এবং গ. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

(ক) আর্থিক পদ্ধতি

আর্থিক নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ঘাটতি অর্থসংস্থান প্রতিরোধ করে তথা অতিরিক্ত নোট প্রচলন বন্ধ করে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়া বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ হলো অর্থের যোগানের বড় অংশ। ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সক্ষম হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যাংকঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে :

(খ) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

(১) ব্যাংক হারের পরিবর্তন : কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণ কমবে। মোট অর্থের যোগান তখন কমে।

(২) খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় : মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণপত্রের ক্রেতা। তাদের হাত থেকে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে চলে আসে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা কমে।

(৩) নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন : মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত বাড়ায়। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেশি ঋণদান করতে পারে। এভাবে পরিমাণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি : গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণদানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। নৈতিক চাপ ও প্রচারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন ঋণের প্রসার কমে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস পায়।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণ দাম স্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি;
- মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বিনিয়োগের সহায়ক;
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। ক. আর্থিক পদ্ধতি, খ. রাজস্ব পদ্ধতি এবং গ. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

ইউনিট মূল্যায়ন-১১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থ কাকে বলে?
২. দ্রব্য বিনিময় প্রথার সংজ্ঞা দিন।
৩. কীভাবে অর্থের সৃষ্টি হয়েছে?
৪. অর্থের চাহিদা কাকে বলে?
৫. অর্থের যোগান কী?
৬. অর্থের প্রচলন গতি কাকে বলে?
৭. ফিশারের সমীকরণে M, V, T কী?
৮. মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন।
৯. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্যাবলি আলোচনা করুন।
২. আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৩. সংকীর্ণ ও বিস্তৃত মুদ্রার পার্থক্য আলোচনা করুন।
৪. অর্থের যোগানের উপাদানগুলো কী?
৫. অর্থের চাহিদার বিভিন্ন ধারণা আলোচনা করুন।
৬. অর্থের পরিমাণের ফিশারীয় তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
৭. অর্থের পরিমাণের নগদ মজুদ ভাষ্যটি আলোচনা করুন।
৮. মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ আলোচনা করুন।
৯. মুদ্রাস্ফীতির আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।